Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৩৬ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই চৈত্র, ১৪২৯ / 24.03.2023

–: সম্পাদক :–

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
ভারতাত্মা শ্রীচৈতন্য	ডাঃ রুহিদাস সাহা
জ্ঞানেশ্বরী	শ্রী সুকৃতি রায়চৌধুরী
Surrender - সমর্পণ	শ্রী অরবিন্দ
শূন্য বলে কিছু নেই	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

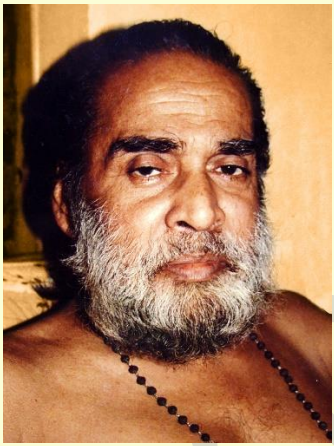

(১০.০৩.১৯২৬ - ২৪.১১.১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"সংসারের কর্তব্যকর্ম ঠিকভাবে না করে ঈশ্বর ঈশ্বর করবার কোন সার্থকতা নেই। সংসারের কর্তব্যকর্মের ভিতর দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে ও এর মধ্যে থেকে নিজেকে ঈশ্বরের হয়ে উঠতে হবে। সংসারকে ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ করা আত্মপ্রবঞ্চনা করা ছাড়া আর কিছু নয়। ভালবাসা, প্রেম, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করতে হবে। নির্লিপ্ত ও আসক্তিশূন্য হয়ে এবং মনে প্রাণে এই ভাব রাখতে হবে যে এই সংসার ঈশ্বরের। তাঁর কর্ম করছি এই ভাব বজায় রাখতে হবে।"

DO NOT COPY

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

পার্থসারথিতে লেখা নিয়ে আমার খুব সমস্যা হয়েছে। যা যা ঘটে যায় কলম ধরলেই ছবির মত সব চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কোনটা লিখি, কোনটা বাদ দিই সেটা ঠিক করে উঠতে পারিনা। কোন ঘটনা কার মনে কি ভাবে React করে আমি বুঝে উঠতে পারিনা। একটা জিনিষ বুঝে ফেলেছি, আমার লেখাটা যাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করছে তারা রীতিমত বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু সত্য ঘটনা গোপন করে আমি আর কার কি উপকার করতে পারি?

প্রায়ই বিভিন্ন জনের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি পাই- "আপনার লেখা খুব ভালো লাগছে।" কেউ লেখেন - "সারা মাস ধরে আপনার লেখাটা পড়বার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকি....." ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপারটা হল আমি কিন্তু শুধু যা যা ঘটনা মনে পড়ে লিখে যাই। ঐ ঘটনাগুলি গত ১৯৫০ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে।

তাঁর আগে আমার একটা দুঃখের কথা বলি। আমার লেখার শব্দগুলো বদলে গেলে অর্থও পালটে যায়। Inverted comma-গুলি যেখানে সেখানে পড়ে গেলে কেমন গোলমেলে মনে হয়। এই তো গত সপ্তাহে Jealousy শব্দটি ছাপা হল Gealousy . আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। অতগুলি বই হাতে লিখে Correct করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।

আমার গরমের ছুটি পড়ে গেল। ছুটি পড়লেই এ বাড়িটাতে আমি হাঁফিয়ে উঠি। শ্রীপ্রীতিকুমার একনাগাড়ে কলকাতায় থাকতে পারতেন না। প্রায়ই বেরিয়ে পড়তেন। তাছাড়া শনি-রবিবার গাড়িতে হয় ডায়মণ্ডহারবার, নয়ত আমডাঙ্গা কালীবাড়ী চলে যেতেন। আত্মপরিচয় দিতে খুব কুণ্ঠিত হতেন। তাই ওখানকার কর্মকর্তারা তাঁকে কখনও কাছে পায়নি। ১৯৭০ সাল থেকেই আমরা বারাসতের বাড়িতে থাকা শুরু করি। ঐ সময়ে আমার রবিবারে NCC Class নিতে হত। তাই তাঁর সঙ্গে আমি বারাসতে যেতে পারতাম না। আমি রবিবার

দুপুরে গিয়ে পৌঁছতাম। মাঝে মাঝে আমার খুব কষ্ট হত অত দূরে নিয়মিত ভাবে যেতে। কিন্তু না গিয়ে পারতাম না। বারাসতের বাড়িটা ওঁর খুব পছন্দের ছিল। বাগান, গাছপালা এসবে ওঁর বরাবরই খুব আকর্ষণ ছিল। কত গাছ লাগিয়ে ছিলেন!! সোজা রাস্তা দিয়ে ভোরবেলা হাঁটতে শুরু করতেন। কখনও সঙ্গে বাপী থাকতো। ছেলের রাজ্যের প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করতেন। একটুও বিরক্ত হতেন না। আমি মোটামুটি রবিবারে ছুটি পেতাম। NCC Parade ও Class সেরে বাড়ি গিয়ে রীতিমত তৈরী খাবার পেতাম। শ্রীপ্রীতিকুমার খুব ভালো রান্না করতেন। বিশেষ করে মাংস, ইলিশ ও তেলাপিয়া মাছ রান্নায় তাঁর জুড়ি ছিলনা বললেই হয়। মাঝে মাঝে শান্তিদি (মিসেস্ ভাজন) যেতেন। তিনিও শ্রীপ্রীতিকুমারকে খুব সেবা করতেন দেখেছি। রাত্রে আমাদের বরানগরে ফিরতে হত। কখনও আমি ও বাপী, কখনও বা শ্রীপ্রীতিকুমার বারাসতে রবিবারটাও থেকে যেতাম। খুব ইচ্ছে ছিল বারাসত – শ্যামবাজার মিনিবাস হয়ে গেলে ওখানে থেকে যাবেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় সেটা হয় নি। এই দিন সাতেক আগে দেখলাম একটা মিনিবাস আমাদের দমদমের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে বারাসত থেকে ধর্মতলা যার গন্তব্যস্থল। মনের মধ্যে তোলপাড় করে উঠলো। সেই বাস চালু হল, আর পাঁচ বছর আগে কেন হলনা? আসলে সবাই তো সব সুখ দেখে যেতে পারেন না।

শ্রীপ্রীতিকুমারকে আমি নীলকন্ঠ বলতাম। শেষের দিকে তাঁর এই বিনা প্রতিবাদে সবকিছু মেনে নেওয়াটা আমার সহ্য হতো না। যার যখন ইচ্ছে আসতো, যখন ইচ্ছে যেতো। নিজেদের সমস্যা তাঁকে জানাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো, অথচ কখনও ভাবেনি তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। এখনও দরকার মতো তাঁর Photo-তে মালা পড়ছে, চন্দন পড়ছে, ধূপ জ্বলছে। তিনি রোজ জল খাচ্ছেন, দই মিষ্টি খাচ্ছেন Photo-র ভিতর দিয়ে। আমি জানিনা তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে কিনা যে কোনও সাধক যখন কারও রোগ সারাতে চেষ্টা করেন, সে রোগটা তাঁর নিজের গ্রহণ করতে হয়। আমি দেখেছি একটি বয়সে শ্রীপ্রীতিকুমার কি ভীষণ ভাবে রোগ সারাবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতেন।

দিনের পর দিন উপবাস করতেন, Concentrate করতেন, কারও Operation ইত্যাদি হলে সব কাজ ফেলে তাঁকে Hospital বা Nursing Home-এ যেতে হবেই। কোনও অবস্থায় তাঁকে বিরত করা যেত না।

আমার মনে পড়ে শেষ যেবার সীতাপুর গেছিলেন, সেবার তাঁর মা নীলরতন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বাপী লক্ষ্ণৌতে টেলিফোনে জানালো। আমি ও পুষ্পদি (রাণী পুষ্পলতা শুক্লা) শ্রীপ্রীতিকুমারকে কিছু বললাম না। কিন্তু কি আশ্চর্য সেই রাত থেকেই তাঁর কি মাথার যন্ত্রণা! কোনও ভাবেই কিছু করা যাচ্ছে না। বাড়িশুদ্ধ সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন লক্ষ্ণৌতে। আমি শ্রীপ্রীতিকুমারের কার্যাবলী দীর্ঘদিন ধরে দেখে দেখে অভ্যস্ত। দেখলাম মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। মাথার মধ্যে খেলে গেলো মায়ের সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়নি তো? পরদিনই আমরা কলকাতায় রওনা হলাম। আমি হাওড়ায় পৌঁছেও বাপীর সাথে কথা না বলে কিছু প্রকাশ করিনি। বাপী খবর দিলো ঠাকুমা ভালোর দিকে। আমি Taxi-তে শ্রীপ্রীতিকুমারকে জিজ্ঞেস করলাম - "আগে বাড়ি যাবে, না Hospital যাবে মাকে দেখতে?" সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন- "আমি জানতাম।" বুঝলাম ওই যাত্রা মা রক্ষা পেয়ে গেলেন। এসব কথা আপাত দৃষ্টিতে অসার মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা যারা এ ঘটনা গুলি প্রত্যক্ষ করেছি তারা জানি এই অলৌকিকত্ব চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না।

শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পর মায়ের আরেকবার কঠিন আক্রমণ হয়। R.G. Kar Medical College-এ ভর্ত্তি হলেন। জ্ঞান ছিল না। চোখ বন্ধ। স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। ক্যাথিটার দেওয়া আছে। বাপী একদিন হঠাৎ বললো, "বাবা বললেন - মা'কে একটু দেখে আসি।" আমি প্রায় সারাদিন R.G. Kar-এ থাকতাম। আমি অনিমাকে বললাম, মায়ের কিছু হবে না, দেখিস। শত্রুদের সামনে অশৌচ অবস্থায় বাপী কোর্টে যাবে না। সত্যি যেতে হয় নি। মায়ের পাশেই একজন বৃদ্ধা ছিলেন। মায়ের একদিন হঠাৎ গ্যাস্ট্রিন দেখা দিল। 'সাকার মোশন' দেওয়া হল। আমি আর অনিমা দেখছি। অনিমা বলল, "সবাই মুখে জল দে।" প্রায় ষাট বছরের হেনাদি কেঁদে উঠলো।

আমাদের বলবার কিছু ছিল না। শ্রীপ্রীতিকুমার বলেছিলেন, "আমি চাই আমার মা ১০৩ বছর পর্যন্ত থাকুন।" সেই কথাটাই ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি মায়ের পাশের বেডের বৃদ্ধার শ্বাস উঠেছে। তাকিয়ে আছি। হঠাৎ দেখি তাঁর বুকটা আর ওঠানামা করছে না। খুব চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, "অনিমা, দেখেছিস?" অনিমা বলল, "চুপ কর।" সেই ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। আমাদের মা কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। যেদিন প্রথম কথা বললেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা, বড় ছেলের সাথে দেখা হয়েছিল?" মা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, এই যে এতক্ষণ এখানে ছিল।" চোখ ঘুরিয়ে বড় ছেলেকে খোঁজবার চেষ্টা করলেন। আমার যা বোঝার বোঝা হয়ে গেলো। মা জ্ঞান ফিরেই অনিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বন্ধু কোথায় গেলো?" শ্রীপ্রীতিকুমার অনিমার কাছে আমার নাম করতেন না। বলতেন, "তোমার বন্ধু এই করেছে, তোমার বন্ধু এই বলেছে ..." ইত্যাদি। অনিমা ধরে নিয়েছে তাঁর দাদাই মায়ের মুখ দিয়ে প্রশ্ন করেছেন।

অনিমাকে খুব ভালবাসতেন। অসম্ভব স্নেহ করতেন। কারও কোন Serious অসুখ হলেই অনিমার কাছে পাঠাতেন। আমার সাথে অনিমাকে দেখতে যেতেন দরকার মতো।

অনিমা খুব গোঁড়া ব্রাহ্মণ বাড়ীর মেয়ে। ওর বিয়ে হয়েছে মিত্র'র সাথে। সেইযুগে জাতপাতের সামাজিক পারিবারিক বাধা ছিলো প্রবল। অসুবিধেটা শ্রীপ্রীতিকুমারকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপ্রীতিকুমার উৎসাহ সহকারে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই আমি সম্প্রদান করবো। কোনও চিন্তা নেই।" অনিমার বিয়ে হয়েছিল হাবড়াতে। সারাদিন কিছু না খেয়ে আমাদের নিয়ে গাড়ীতে করে হাবড়াতে গেছিলেন এবং সাত্বিক ভাবে অনিমাকে শ্রী দিলীপ মিত্রর হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

সমাজ সেবা প্রচুর করতেন। এ'রকম বিয়ের ব্যবস্থা অনেক করেছেন। শ্যামবাজারের বাড়িতে বহু ব্যক্তির বিয়ে দিয়েছেন মেয়ে উঠিয়ে এনে, নয়ত ছেলে উঠিয়ে এনে। তারা এখনও সুখে সংসার করছে। যেখানে 'না' বলতেন, সেখানে কোনওভাবে 'হ্যাঁ' করানো যেত না। অন্যায়ের সাথে আপোষ করেন নি

কখনও। কখনও দায়িত্ব এড়াতে দেখিনি তাঁকে। তাঁর অতি আপনজনেরা নিজেদের ইচ্ছেমতো দিনের পর দিন তাঁর সাথে কথা বলেনি, তাঁর কাছে আসেনি। প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছেন – কিন্তু সব আচরণই নিজের প্রাপ্য বলে ধরেছেন। এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা দেখে আমি পরবর্তীকালে ভীষণ ক্ষুব্ধ থেকেছি। আমি ক্ষমা করতে পারিনি। আমি সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য তাঁকে দায়ী করেছি। যাঁর এত ক্ষমতা তিনি কেন তাঁর নিজের সংসারে এত দুঃখ কষ্ট টেনে আনেন? তিনি কেন নিজের সংসারটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন না? এ অভিযোগ আমার আজও আছে। তবে আজ আমি অনেক কিছু নিজের কর্মফল বলে ধরে নিতে পারি। আমার জীবনে সংগ্রাম করতে হবে, ধার্য আছে, তাই করছি।...দোষ আর দেবো কাকে?

এই যে "পার্থসারথি" – সবাই জানেন আষাঢ় মাস থেকে বার্ষিক চাঁদা দিতে হয়। কিন্তু প্রায় পৌষ মাস পর্যন্ত টাকা আসতে থাকে। আমি কিন্তু ছ' মাস বই এমনি পাঠিয়ে যাই। যেই বই বন্ধ হয় অমনি টাকা আসে M.O. হয়ে। তারপরই চিঠি আসতে শুরু হয় – "ঐ মাসের বই পাইনি কেন? এই মাসের বই আসতে দেরি হল কেন? এরকম হলে বই নেওয়া বন্ধ করে দেবো, ইত্যাদি ইত্যাদি।" আমি শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ নই। আমি সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিই যে আমি বই ছ' মাস free পাঠিয়েছি। যদি কেউ না পান P.O.-তে খবর নিন। আমি নিজে বই Pack করি। ডাকে পাঠাই। আমার এটা ধর্মাচরণের মতো। সুতরাং আমার এটা ভুল হবার কথা নয়। দরকার হলে ঐ টাকা আমি ফেরৎ পাঠিয়ে দেব। অপর দিক চুপচাপ হয়ে যান। এখন দিনকালই এমন! সকলে মনে করে দয়া করছে। তাঁদের একবারও মনে হয়না একটা পত্রিকা চালাতে কি খরচ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন! এটাতো আমাদের পেশা নয়, এটা শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

যাইহোক আমরা সাধারণ মানুষ। দোষত্রুটি আমাদের থাকবেই। পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই তাদের সহৃদয়তা দিয়ে সে ত্রুটি ক্ষমা করে নেবেন। সবসময় তো সব কাজ নিজের পছন্দমতো হয়না। কখনও কখনও অন্যের ইচ্ছের উপরেও নির্ভর

করতে হয়। আমরা এই পার্থসারথি প্রকাশনা শ্রীপ্রীতিকুমারের ইচ্ছে বলেই ধরে নিয়েছি। তাঁর এই ইচ্ছে যেদিন থাকবে না, সেদিন বোধহয় আমাদের জীবনে অনেক অতিরিক্ত সময় হাতে আসবে।

– – – – – – – – – – – – – –
(** রচনাকাল – মে, ১৯৯০)

ভক্ত বৎসল শ্রী রামকৃষ্ণ **শ্রী প্রণব ঘোষ**

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বরে। তখন তিনি গুরুর সন্ধান করছিলেন। ঠাকুরের বালকসুলভ সরলতা ও মধুর আলাপে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু তিনিই যে তাঁর গুরু একথা বুঝে উঠতে পারেননি। কিছুটা মনের দ্বন্দ্ব কিছুটা শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরে যাননি। ঠাকুরকে তিনি দ্বিতীয়বার দর্শন করেন বলরাম ভবনে। ঠাকুরকে এড়াতে চাইলেও এড়াতে পারলেন না। ঠাকুর পরমাত্মীয়ের মতো তাঁর খোঁজ খবর নিলেন এবং বার বার দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্যে বললেন। এতে তাঁর সব দ্বিধা কেটে গেল। তিনি বুঝলেন ঠাকুর তাঁকে ভোলেননি, তাঁকে চান। সেই থেকে ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যেতে শুরু করেন।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি ঠাকুরকে বললেন, "আমার বড় ইচ্ছা আপনার কাছে মন্তর নিই।" ঠাকুর বললেন, "কি করব বাপু, আমি তো কাউকে মন্তর দিই না।" এ কথায় দেবেন্দ্রনাথ দুঃখিত হলেও একেবারে আশা ছাড়লেন না; সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। একদিন পট্টবস্ত্র পরে, হাতে ফুল, ফুলের মালা ও তোড়া নিয়ে ঠাকুরের কাছে হাজির হলেন, উদ্দেশ্য দীক্ষা গ্রহণ। ঠাকুর

DO NOT COPY

ফুলের প্রশংসা করলেন এবং ফুলের তোড়াটি নিয়ে বাকীগুলো মায়ের ঘরে দিয়ে আসতে বললেন, কিন্তু মন্ত্র দিলেন না। আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষা না পেলেও দেবেন্দ্র অনুভব করলেন তিনি ঠাকুরের কৃপা পেয়েছেন। পথে চলতে চলতে দেখতেন ঠাকুর সামনে চলছেন। বাড়িতেও ঠাকুরের দেখা পেতেন, বুঝতে পারতেন ঠাকুর সর্বদাই তাঁর রক্ষাকর্তা।

দক্ষিণেশ্বরে বালক ভক্তরা ঠাকুরের সেবা করে দেখে দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হয় তিনিও অনুরূপভাবে ঠাকুরের সেবা করবেন। একদিন ঠাকুর শৌচে যাবেন শুনে তিনি গাড়ু গামছা নিয়ে তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলেন। ঠাকুর অবশ্য তাঁকে যেতে দিলেন না, বললেন তাঁর জন্য ও ভাব নয়। অভিমানী দেবেন্দ্র তা বুঝলেন না, তিনি মনে করলেন তিনি এতই হীন যে ঠাকুরের গাড়ু গামছা বইবারও যোগ্য নয়। ফিরে এসে পঞ্চবাটীতে বসে চিন্তা করতে লাগলেন এবং নিমেষের মধ্যে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। জ্ঞান হলে দেখলেন ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মধুর স্বরে আশ্বাস দিয়ে ঠাকুর তাঁকে বললেন, “দেখ, তোমার কিছু করতে হবে না, তুমি সকালবেলা আর সন্ধ্যাবেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম ক’রো, তা হলেই হবে। হরিনাম চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন – বড় সিদ্ধ নাম। আর এখানে আনাগোনা করলে সব হয়ে যাবে।” সেই থেকে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে দেবেন্দ্র হরিনাম জপ করতে থাকেন। হরিনামে তিনি এতই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে ঘুমন্ত অবস্থাতেও তাঁর মুখ থেকে হরিনাম উচ্চারিত হত।

অন্যান্য ভক্তরা ঠাকুরকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আনন্দ করেন দেখে দেবেন্দ্রেরও অনুরূপভাবে আনন্দোৎসব করতে ইচ্ছা হয়। ঠাকুরের কাছে সে ইচ্ছা প্রকাশ করলে ঠাকুর বলেছিলেন, “গাড়ি ভাড়া যে অনেক লাগে, তোমার আয় তেমন নয়।” দেবেন্দ্র তাতে পিছ্‌পা না হয়ে বলেছিলেন, “তা হোক, মশাই, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।” গিরিশচন্দ্র সমস্ত খরচ বহন করতে চাইলেও তিনি তাতে রাজী হননি। দেবেন্দ্রের আদর আপ্যায়নে বিশেষ করে পরিবারবর্গের গভীর ভক্তি দেখে সকল ভক্ত এবং ঠাকুর নিজে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। যাবার সময় ঠাকুর দেবেন্দ্রকে একবার বাড়ির সবাইকে নিয়ে

দক্ষিণেশ্বরে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। দেবেন্দ্র সেই অনুসারে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে ঠাকুর তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের বৃদ্ধা মা ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ঠাকুর আঙ্গুল দিয়ে দেবেন্দ্রের জিভে কিছু একটা লিখে দেন। তাতে দেবেন্দ্রের বিশ্বাস হয় ঠাকুর তাঁর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। ঐ শক্তির জোরে তিনি কত লোককে যে ঈশ্বরাভিমুখী করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

সুরেশচন্দ্র দত্ত

সুরেশচন্দ্র নাগ মশায়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রথমে ঠাকুরকে দর্শন করেন। সুরেশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে সাকার উপাসনায় আস্থা হারিয়েছিলেন। মন্ত্রে বা দীক্ষায়ও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। অথচ নাগ মশাই তাঁকে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতে পরামর্শ দিতেন। সুরেশচন্দ্র সে পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, তবে নাগ মশাইয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দীক্ষা সম্পর্কে ঠাকুরের মতামত জানতে আপত্তি করেন নি। ঠাকুর তাঁকে দীক্ষার প্রয়োজন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দীক্ষা নিতে রাজী হন নি। তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন, “আমার তো মন্ত্রে বা ঈশ্বরীয় রূপে বিশ্বাস নেই।” ওখন ঠাকুর বলেছিলেন, “তবে তোমার এখন দীক্ষার দরকার নেই। পরে তুমি এর প্রয়োজন বুঝবে, সময়ে তোমার দীক্ষা হবে।”

সুরেশচন্দ্র ইংরেজ সরকারের সমর বিভাগে কাজ করতেন এবং সেই উপলক্ষে কোয়েটায় থাকতেন। সামরিক বিভাগের কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে তিনি যখন কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন ঠাকুর অসুস্থ হয়ে কাশীপুরে অবস্থান করছেন। এতদিনে সুরেশচন্দ্র দীক্ষার প্রয়োজন বুঝেছেন এবং দীক্ষার জন্য রীতিমত আগ্রহ অনুভব করছেন, কিন্তু ঠাকুর অসুস্থ বলে তাঁর কাছে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারছেন না।

DO NOT COPY

কিছুদিন বাদেই ঠাকুর ইহলীলা সম্বরণ করেন। ফলে সুরেশচন্দ্রের দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। তাতে সুরেশচন্দ্রের মনে অনুতাপের আগুন জ্বলে উঠল। ঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষালাভের সুযোগ হারাবার জন্য তিনি নিজেকেই দোষারোপ করতেন। প্রায়ই গঙ্গার ঘাটে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতেন। আবার কখনও বা ঠাকুরের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাতেন।

ঠাকুর সুরেশচন্দ্রের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিলেন। একদিন সুরেশচন্দ্র স্বপ্নে দেখলেন ঠাকুর গঙ্গা থেকে উঠে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা শেষে ভক্তি বিনম্র চিত্তে যখন তিনি ঠাকুরের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করবেন তখন আর ঠাকুরকে দেখা গেল না। বিস্মিত শিহরিত সুরেশচন্দ্র বুঝলেন ভক্ত-বৎসল ঠাকুর ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করতে নিত্য লীলার আশ্রয় দিয়েছেন।

শ্রী অক্ষয় কুমার সেন

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথির রচয়িতা হিসাবে যিনি অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেই অক্ষয় সেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন মহিম চক্রবর্তী মশাইয়ের কাশীপুরের বাড়ীতে। ঠাকুরের শুভ পদার্পণ উপলক্ষে চক্রবর্তী মশাই নিজের বাড়িতে সব ভক্তদের নিমন্ত্রণ করে মহোৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে সেই মহোৎসবে যোগদান করেন। সেই ভক্তমেলায় ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি লাভে কৃতার্থ হয়ে অক্ষয়কুমার লিখেছিলেনঃ

করুণ কটাক্ষ পাতে জানি না কি আছে তাতে,
বর্ণনায় নহে বর্ণিবার।
শ্রীমূর্তি নয়নদ্বারে প্রবেশি হৃদয়পুরে
হৃদয় করিল অধিকার...
আপনে আপন হারা বহিল নূতন ধারা
সেই দেহে হইনু নূতন। ...
কিছু না পাই খুঁজে যেন কোন নব রাজ্যে
স্বপনে হয়েছি আগুয়ান। (পুঁথি)

কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন (১লা জানুয়ারী, ১৮৮৬) 'কল্পতরু' হন ভাগ্যক্রমে অক্ষয় কুমার ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন ভক্ত তখন গাছের ডালে বানর – বানর খেলছিলেন। ঠাকুরকে আসতে দেখে অক্ষয় কুমার গাছ থেকে নেমে তাঁর পিছু পিছু চলতে আরম্ভ করেন। তাঁর হাতে দুটি চাঁপা ফুল ছিল। ঠাকুর পথের উপর দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লে তিনি ফুল দুটি ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দেন–

"পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে।
তোলা দুটি চাঁপা ফুল দিনু দুটি পায়ে।"

সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে ঠাকুর হাত তুলে "তোমাদের চৈতন্য হোক"– এই বলে সকলকে আশীর্বাদ করেছিলেন। কল্পতরু লীলা শেষে ঠাকুর যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন অক্ষয় কুমারকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর বুক স্পর্শ করে কানে মন্ত্র দেন।

"দূর থেকে সম্ভাষিয়া কিগো বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিয়া বক্ষের উপরে।
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্র বাক্য তাই রাখিনু গোপনে।" (পুঁথি)

সেই পবিত্র স্পর্শের তীব্র অমোঘ প্রভাবে অক্ষয় কুমারের দেহে সাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়। দেহ বেঁকেচুরে কিম্ভূত আকার ধারণ করে এবং তিনি কেঁদে ফেলেন। অক্ষয় কুমার দীর্ঘদিন ঠাকুরের সঙ্গ করতে পারেননি সত্য, কিন্তু তাঁর উপর ঠাকুরের কৃপা কিছু কম ছিল না। সারা জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ নামের মহিমা খ্যাপন করে, চরম মুহূর্তে ঠাকুর ও মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করে, শ্রীরামকৃষ্ণলোকে প্রয়াণ করেছিলেন।

নবগোপাল ঘোষ

নবগোপাল প্রথম দিনেই সপরিবারে ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছিলেন। সেদিন ঠাকুর তাঁকে প্রত্যহ কীর্তন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই উপদেশ

অনুসারে তিনি খোল করতাল সহযোগে বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রত্যহ কীর্তন করতেন, কিন্তু তিন বছরের মধ্যে তাঁর আর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। একদিনের আলাপ, তাহলেও কিন্তু তাঁকে মনে রেখেছিলেন এবং ভক্ত কিশোরীর কাছে তাঁর খোঁজ নিয়েছিলেন। সে কথা শুনে আনন্দে নবগোপালের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি অবাক হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, "ইনি সর্বজন সম্মানিত এবং অবতাররূপে পূজিত হয়েও আমার ন্যায় দীন ব্যক্তিকে এতকাল স্মরণ করে রেখেছেন।" এরপর আর দেরী না করে তিনি পরের রবিবারই সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। ঠাকুরের উপদেশ অনুসারে তিনি তিন বছর নামকীর্তনে কাটিয়েছেন জেনে ঠাকুর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর আর বৈধী সাধনার দরকার হবে না, বার কয়েক দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করলেই তাঁর হয়ে যাবে।

ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে নবগোপালের মনের আমূল পরিবর্তন হয়। তিনি উচ্চ দায়িত্বশীল পদে কাজ করতেন, তথাপি তিনি সর্বদা ঠাকুরের চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে থাকতেন এবং সুযোগ পেলেই সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসতেন। ঠাকুর হয়ে উঠেছিলেন তাঁর এবং তাঁর পরিবারবর্গের সর্বক্ষণের ধ্যান জ্ঞান।

তখন ঠাকুরের ভক্তরা ঠাকুরকে নিয়ে উৎসব করতেন। প্রায় প্রতি রবিরার কোন না কোন ভক্তের বাড়িতে মহোৎসব হত। নবগোপালও তাঁর বাদুড় বাগানের বাড়িতে অনুরূপ মহোৎসব করার কথা চিন্তা করেন। তাঁর প্রস্তাবে ঠাকুর অনুমতি দিলে মহোৎসবের আয়োজন হল। এই উপলক্ষে পদাবলী কীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। কীর্তন শুরু হতে না হতেই ঠাকুর কীর্তনে যোগ দিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ ত্রিভঙ্গ মুরারীর মতো দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে রইলেন। ভক্তরা তাঁকে ঘিরে কীর্তন করতে লাগলেন। করো কারো ভাবও হল। শেষ পর্যন্ত সমাধি ভঙ্গ হলে ঠাকুর ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! নবগোপাল দেখলেন ঠাকুরের দেহে চন্দ্র কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ জ্যোতি। মুখমণ্ডলেও অপূর্ব দিব্য জ্যোতির ছটা। অথচ অপর কোন ব্যক্তির দেহে তেমন কোন প্রভা দেখা গেল না। হয়ত বা ভুল দেখছেন মনে করে চোখে জল দিয়ে এলেন। কিন্তু

তখনও সেই দিব্য প্রভা আগের মতোই ঠাকুরের দেহ আলোকিত করে রয়েছে। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন তাঁর প্রতি কৃপাবশতঃ ঠাকুর ঐ জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করেছিলেন।

ঘোষ গিন্নীও খুব ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুর যেন তাঁর হাতে খান। অন্তর্যামী ঠাকুর সে প্রার্থনা শুনেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, তুই আমাকে হাতে করে খাওয়াবি?" তারপর একটুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে বললেন, "আচ্ছা, দে।" ঘোষ গিন্নী ঠাকুরকে মিষ্টি খাওয়াতে গিয়ে দেখেন তাঁর ভেতর থেকে কি একটা জিনিস 'অঁক' করে ঠোঁট পর্যন্ত এসে খাবার গ্রহণ করছে। তা দেখে তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। খাওয়ানো শেষ হলে ঠাকুর তাঁকে প্রসাদ গ্রহণ করতে বলেন।

কাশীপুরে ঠাকুর যখন 'কল্পতরু' হয়েছিলেন নবগোপাল তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপাও লাভ করেছিলেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে নবগোপাল ঠাকুরকে বলেছিলেন, "প্রভু, আমার কি হবে?" ঠাকুর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেছিলেন, "একটু ধ্যানজপ করতে পারবে?" নবগোপাল অবসরের অভাবের কথা জানালে ঠাকুর শুধু জপ করতে পারবেন কিনা জানতে চেয়েছিলেন। নবগোপাল সে প্রস্তাবে সম্মত হচ্ছেন না দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, "আচ্ছা আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?" নবগোপাল সাগ্রহে সে প্রস্তাব গ্রহণ করে বললেন, তা খুব পারব।" ঠাকুর তখন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তা হলেই হবে – তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।" এর পর নবগোপাল রামকৃষ্ণ নামে বিভোর হয়ে থাকতেন। তিনি সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরলে পাড়ার ছেলেমেয়েরা সবাই তার কাছে আসত এবং 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে নৃত্য করত। তিনি সবাইকে বাতাসা দিতেন। প্রত্যহ এই কাজ করতেন বলে তিনি 'জয় রামকৃষ্ণ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের লীলা ক্ষেত্র পুরী তখন ছিল সর্বভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে প্রধান। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে রথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তগণ পুরীতে আসতেন শুধু জগন্নাথ দর্শন করতেই নয়, সচল গৌর-জগন্নাথ দর্শন করতেও। পুরীতে গৌর দর্শন করে ব্রহ্মানন্দ ভারতী বললেন - নীলাচলে এখন দুই ব্রহ্ম। জগন্নাথ - অচল শ্যাম ব্রহ্ম, আর তুমি - সচল গৌর ব্রহ্ম। বঙ্গ সহ সারা ভারত থেকে আগত ভক্তগণ মিলিত হয়ে কীর্ত্তনানন্দে গাইতেন - ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। এই সময় বিভিন্ন প্রদেশ থেকে হিন্দুগণ আসতেন জগন্নাথ দর্শনে, অনেকে বসবাসও করতেন সেখানে। ফলে, শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভের সুযোগও হয়েছিল তাদের আর এ ভাবেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অন্যান্য মানুষ শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য নিজেকে বঙ্গভূমিতে আবদ্ধ করে রাখেন নি। তিনি শুধু বাঙ্গালী নন, সামগ্রিকভাবে তিনি একজন ভারতীয়, অন্তরে তিনি একজন একনিষ্ঠ ভারত-প্রেমিক। একদিকে তাঁর অন্তরে ছিল ভারত প্রেম, অপরদিকে, ভারতবাসীর অন্তরে ছিল গৌর-প্রেম। ভারতবাসী তাঁকে অন্তরের অন্তঃস্থলে বসিয়ে পুজো করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সম-সাময়িক ভক্তদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা অনেক। অবাঙ্গালী ভক্ত-শিষ্যদের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁর সম-সাময়িক অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে অন্ততঃ চুয়াল্লিশ জন উড়িয়া, একজন গুজরাটী, তিনজন মহারাষ্ট্রীয়, চারজন রাজপুত, দশজন দ্রাবিড়ীয়। এ ছাড়া তাঁর ভক্তদের মধ্যে অসমীয়া ও ত্রিহুতিয়া সহ অন্যান্য প্রদেশের লোক ছিলেন। দশজন দ্রাবিড়ীয়র মধ্যে তিনজন বাঙ্গালীই হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা হলেন সনাতন, রূপ ও শ্রীজীব। এঁদের বংশ পরিচয়ে জানা যায়, শ্রীসর্বজ্ঞ নামে কর্নাটকের একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, চারিবেদের অধ্যাপনাতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কর্ণাটক-দেশীয় জন-সাধারণের মধ্যে তিনি বিশেষ পুজো ও সম্মানের পাত্র ছিলেন বলে তিনি 'জগদ্‌গুরু' নামে

খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শ্রীসর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর পুত্র অনিরুদ্ধ। ইনিও বেদজ্ঞ ছিলেন। শ্রীঅনিরুদ্ধের দুই পুত্র – রূপেশ্বর ও হরিহর। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর বহু শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, কনিষ্ঠ হরিহর ছিলেন শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী। অনিরুদ্ধ দুই পুত্রকে রাজত্ব ভাগ করে দেন। কিছুদিন পরে অনুজ হরিহর জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যভ্রষ্ট করে স্বয়ং সমগ্র রাজ্য অধিকার করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হয়ে আটটি অশ্ব ও পত্নীকে নিয়ে পৌলস্ত্য দেশে পলায়ন করেন এবং পৌলস্ত্যের রাজা শিখরেশ্বরের বন্ধুত্ব লাভ করে সেখানেই বসবাস করেন। এখানে তাঁর এক পুত্র জন্মে, নাম পদ্মনাভ। পদ্মনাভ সাঙ্গ যজুর্ব্বেদে, সমস্ত উপনিষদে ও রসশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শেষ বয়সে গঙ্গা বাস করার উদ্দেশ্যে শিখরেশ্বরের রাজ্য ত্যাগ করে গঙ্গাতটের কাছে নবহট্ট অর্থাৎ বর্তমান কালনার পার্শ্ববর্তী নৈহাটী গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানে তিনি রাজা দনুজমর্দ্দনের সৌহার্দ্য লাভ করে সুখে বসবাস করতে থাকেন। পদ্মনাভের আঠারোটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র। পুত্রদের মধ্যে পুরুষোত্তম সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, তারপরে জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব। ধর্ম-প্রাণ কুমারদেব কোনও কারণে নৈহাটী থেকে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে যেয়ে বাস করতে থাকেন। যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তাঁর এক বাড়ী ছিল। এই কুমারদেবের পুত্রই সনাতন, রূপ ও অনুপম। অনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন ছিলেন বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সাকর মল্লিক অর্থাৎ রাজস্ব মন্ত্রী, রূপ ছিলেন দবীর খাস অর্থাৎ মুখ্য সচিব। সন্ন্যাস গ্রহণের পঞ্চম বর্ষে শ্রীচৈতন্য যখন রামকেলিতে এসেছিলেন তখনই এঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের তাঁর চরণে সমর্পণ করেন। সনাতন ও রূপ শ্রীচৈতন্য প্রদত্ত নাম। পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে পত্রে এঁরা শ্রীচৈতন্যের কাছে নিজেদের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ অনুসারে সনাতন কাশীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আর রূপের সঙ্গে মিলন হয় প্রয়াগে। এই বংশ পরিচয় থেকে দেখা যায়, শ্রীজীবের ঊর্দ্ধতন অষ্টম, সপ্তম এবং ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন কর্ণাটকের রাজা। দ্রাবিড়দেশের অপর ভক্তগণ হলেন কাশীশ্বর গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, ত্রিমল্ল ভট্ট, রাঘব গোস্বামী, রামদাস বিপ্র ও প্রবোধানন্দ। কাম

ভট্ট, সিংহ ভট্ট এবং হরিভট্ট ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়। শিবানন্দ দস্তুর ছিলেন গুজরাটের পার্শী। কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী একজন পাঞ্জাবী ভক্ত।

উড়িয়া ভক্তদের মধ্যে মহিমময়দের নাম–অচ্যুতানন্দ, অনন্ত আচার্য্য, অমোঘ পন্ডিত, কানাই খুঁটিয়া, কানাই খুঁটিয়ার পুত্র জগন্নাথ ও বলরাম খুঁটিয়া, কালী মিশ্র, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণানন্দ, গোপাল গুরু, গোপীনাথ আচার্য্য, গোপীনাথ পট্টনায়ক, গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, চন্দনেশ্বর, জগন্নাথ দাস, জগন্নাথ দ্বিজ চক্রবর্তী, জগন্নাথ মাহাতি, জগন্নাথ–সেবক জনার্দ্দন ব্রাহ্মণ, তুলসীমিশ্র পড়িছা, দামোদর পণ্ডিত, নন্দায়ি, পরমানন্দ মহাপাত্র, দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা পীতাম্বর, পুরুষোত্তম, রাজা প্রতাপ রুদ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, গ্রহরাজ মহাপাত্র, রায় রামানন্দ, রায় রামানন্দের পিতা ভবানন্দ ও ভ্রাতা বাণীনাথ নায়ক, শিখি মাহাতি, শিখি মাহাতির ভগিনী মাধবী দেবী ও ভ্রাতা মুরারি মাহাতি, মাধব পট্টনায়ক, মামু ঠাকুর, যশোবন্ত, রঘুনাথ বিপ্র, রামচন্দ্র দ্বিজ, বলদেব মাহাতি, বিপ্রদাস, শিবানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনাথ মিশ্র, সিংহেশ্বর, রাজা প্রতাপ রুদ্রের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম (তাঁর আদি নিবাস অবশ্য বঙ্গদেশে) ও হরিদাস দ্বিজ।

শ্রীচৈতন্য নিজেকে স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ করে রাখার বিরোধী ছিলেন। ভারতের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি; ভারতের জনমানসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তিনি। শ্রীচৈতন্যের জীবনে সংকীর্ণতার স্থান ছিল না, ছিল না সাম্প্রদায়িক মনোভাবও। তিনি ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষা এবং কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিলেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে না রেখে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিরি, তীর্থ, অরণ্য, সরস্বতী, আশ্রম, যতি, অবধূত প্রভৃতি উপাধিধারী সন্ন্যাসীকেও কৃপা করতে তিনি কার্পণ্য করেননি। সেই কারণে এই সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ তাঁর কৃপা লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে সাহিত্য জগতে নবযুগের সূচনা হয়েছে, তাঁকে কেন্দ্র করে সাহিত্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্যের সম সাময়িক চারশ নব্বই জন অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে অন্ততঃ আটান্ন জন অর্থাৎ শতকরা বারো জন

কবি লেখক পদকর্ত্তা। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষের মতো তিন ভাইয়ের একসঙ্গে কবি হওয়াও পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। কিন্তু এ সবই সম্ভব হয়েছে মহাপ্রভুর দর্শনে, মূকও বাচাল হয়েছে, সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে বঙ্গ সাহিত্যে কয়েক শতাব্দীর অগ্রগতি হয়েছে। আর সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বাঙালীর শিক্ষা সংস্কৃতি সাধনা নতুন প্রাণে স্পন্দিত হয়েছে। মৃতপ্রায় সংস্কৃত সাহিত্য শ্রীচৈতন্যের স্পর্শে নতুন জীবন লাভ করেছে, নব নব সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শুধু বাংলা আর সংস্কৃতই বা কেন বিপুল শ্রীচৈতন্য সাহিত্যে উড়িয়া, অসমীয়া ও হিন্দী ভাষাও স্থান করে নিয়েছে।

উড়িষ্যার বৌদ্ধগণ হিন্দু-ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করে জগন্নাথদেবকেই বুদ্ধ-জ্ঞানে পুজো করতেন। এই সম্প্রদায়ের যে পাঁচজন ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে পঞ্চ সখা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে শ্রদ্ধার আসনে বসেছিলেন তাঁরা হলেন-জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত দাস। এঁরা শ্রীচৈতন্যের সান্নিধ্যে এসে শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করেছেন এবং পরবর্তীকালে এঁরা বুদ্ধের অবতার জ্ঞানে শ্রীচৈতন্যকে পুজো করেছেন।

পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ উড়িয়া ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থ 'শূন্য সংহিতায়' শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এই গ্রন্থে অচ্যুতানন্দ লিখেছেন যে, শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় সনাতন গোস্বামী তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

উড়িয়া লেখক দিবাকর দাস রচিত "জগন্নাথ চরিতামৃত"তে পঞ্চসখার অন্যতম সখা জগন্নাথ দাসের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কের কথা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, উড়িয়া ভাষায় জগন্নাথ দাসের লেখা শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ শুনে শ্রীচৈতন্য মুগ্ধ হয়েছিলেন। দিবাকর দাস আরও লিখেছেন যে, পঞ্চসখার অন্যতম বলরাম দাস সবসময় শ্রীচৈতন্যের কাছে থেকে তাঁর সেবা করতেন। দিবাকর দাসের মতে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দাসের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মাথায় নিজের উত্তরীয় বেঁধে দিয়েছিলেন।

উড়িয়া লেখক ঈশ্বর দাস বিরচিত 'চৈতন্য ভাগবত'-এ দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে যাজপুর থেকে কটকে আসবার পথে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রাজার অমাত্য ও পঞ্চসখার অন্যতম সখা বলরাম দাসের পিতা সোমনাথ মহাপাত্রের সাক্ষাৎ হয় এবং সেখানেই বলরাম দাস শ্রীচৈতন্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঈশ্বর দাস রচিত চৈতন্য ভাগবতেও দেখা যায়, জগন্নাথ দাসের ভাগবত পাঠ শুনে শ্রীচৈতন্য অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছিলেন। আরও জানা যায়, শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশেই বলরাম দাস জগন্নাথদাসকে দীক্ষিত করেন এবং জগন্নাথ দাস প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যের সেবা করতেন। ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবতের মতে জগন্নাথ বিগ্রহের স্বপ্নাদেশ পেয়ে অন্যতম সখা যশোবন্ত শ্রীচৈতন্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঈশ্বরদাসই লিখেছেন, পঞ্চসখার অপর সখা অনন্ত দাস কোনারকে শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করেন এবং সেখানেই তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেন। 'চৈতন্য ভাগবতে'র রচয়িতা ঈশ্বর দাস সেই পঞ্চসখারই শিষ্য। তিনিও শ্রীচৈতন্যকে সর্ব্বত্র বুদ্ধ অবতার রূপে বন্দনা করেছেন এবং জগন্নাথদেবেরই যে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভাব ঘটেছে সে কথাও বলেছেন।

উৎকল দেশীয় গোবিন্দদেব রচনা করেছেন-গৌর কৃষ্ণোদয় কাব্যম্। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত কানাই খুটিয়া রচনা করেছেন শ্রীচৈতন্য জীবনী গ্রন্থ 'মহাপ্রকাশ'। এ ছাড়াও উড়িয়া ভাষায় রচিত অন্যান্য লেখকদের শ্রীচৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলির নাম-চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী, চৈতন্য সম্প্রদায়, চৈতন্য পূজা মন্ত্র, ভক্তি চন্দ্রোদয়, স্বপ্ন দাসকৃত বৈষ্ণব সারোদ্ধার, গোবিন্দ ভট্টকৃত চৈতন্যাবলী, চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্ক ঝুলন ছন্দ, সরঙ্গী শ্রীরাধাকান্ত মহাপ্রভুঙ্ক মহিমা সাগর, সদানন্দকৃত 'মোহন কল্পলতা' ও শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বিষয়ক 'ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল'।

সমকালীন হিন্দী ভাষায়ও শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। রামানন্দী সম্প্রদায় ভুক্ত অগ্রদাস স্বামীর শিষ্য নাভাদামজী হিন্দী ভাষায় 'ভক্তমাল' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে নাভাদামজী শ্রীচৈতন্যকে অবতার জ্ঞানে ভক্তি নিবেদন করেছেন। শ্রীচৈতন্য ছাড়াও এই গ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ, বিষ্ণুপুরী, রঘুনাথ,

DO NOT COPY

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, মধু গোঁসাইজী, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, ভূগর্ভ, কাশীশ্বর, প্রতাপরুদ্র, ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভক্তির গুণ কীর্ত্তিত হয়েছে! নাভাজী লিখেছেন, জগন্নাথদেবের সন্মুখে গরুড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকতেন বলে রঘুনাথ গোস্বামীকে উৎকল বাসীরা 'গরুড়ঙ্গী' বলতেন।

হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থের লেখকের অনুরোধে ঐ গ্রন্থের টীকা লিখেছেন প্রিয়দাসজী। এ সম্পর্কে প্রিয়াদাসজী লিখেছেন, তিনি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান করে নাম গান করছিলেন তখন নাভাদামজী এসে তাঁকে ভক্তমাল গ্রন্থের টীকা লিখতে অনুরোধ করেন। প্রিয়দাসজী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত, তিনি বৃন্দাবনে বাস করতেন। 'অনুরাগবল্লী'র লেখক মনোহর দাস প্রিয়দাসজীর গুরু। প্রিয়দাসজী তাঁর রচিত টীকার 'ভক্তমাল' গ্রন্থে লিখিত সকল ভক্তেরই মহিমা বর্ণনা করেছেন। যশোমতীসূত কৃষ্ণই যে শচীসূত গৌর একথা তিনি বলেছেন। প্রিয়দাসজী কবি কর্ণপূর সম্পর্কে লিখেছেন, বৃন্দাবনে এসে শ্রীরূপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে প্রেম বশে শ্রীরূপের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস কবি কর্ণপূরের গায়ে লাগলে তা আগুনের হল্কার মতো অনুভূত হচ্ছিল। প্রিয়দাসজী আরও যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা হলো (এক) লোকনাথ গোস্বামী ভাগবত গান করতেন ও ভগবৎ পাঠককে প্রাণতুল্য মনে করতেন। (দুই) ভূগর্ভ গোস্বামী বৃন্দাবনের গোবিন্দকুঞ্জে বাস করতেন। (তিন) কাশীশ্বর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় নীলাচল থেকে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন এবং গোবিন্দের সেবার অধিকার পেয়েছিলেন। (চার) রাজা প্রতাপ্ররুদ্র শ্রীচৈতন্যের কৃপা না পেয়ে একদিন প্রভুর রথাগ্রে নৃত্যের সময় তিনি তাঁর চরণে পতিত হলেন, প্রভু তাঁকে উঠিয়ে বুকে তুলে নিলেন এবং প্রেম সমুদ্রে নিমগ্ন করলেন। প্রবোধানন্দকে প্রিয়দাসজী শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্ত বৃন্দাবনবাসী বলেছেন।

অসমীয়া গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর ভক্তদের কথা রয়েছে। তা থেকে শ্রীচৈতন্য ও সমসাময়িক আসামে আবির্ভূত মহাপুরুষ শংকরদেবের সম্পর্কের একটি ছবি পাওয়া যায়।

অদ্বৈত আচার্য্য, শংকরদেব ও শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক। তবে বয়সে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা অদ্বৈত আচার্য্য ও শংকরদেব উভয়েই অনেক বড়। অদ্বৈত আচার্য্যের পিতার বাসভূমি ছিল তদানিন্তন আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্টে। জ্ঞানী পুরুষ রূপে শ্রীঅদ্বৈতের খ্যাতি তখন বহুদূর প্রসারিত। সে কারণে অদ্বৈত আচার্য্যের প্রতি শংকরদেবের আকর্ষণ স্বাভাবিক। সেই আকর্ষণেই পত্নীর মৃত্যুর পর চুয়াল্লিশ বছর বয়সে শংকরদেব তীর্থ ভ্রমণে গমন করেন এবং বারো বছর তীর্থ ভ্রমণ করে অবশেষে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে। সেখানে তিনি অদ্বৈতের কাছে ভাগবত পাঠ করেন। অদ্বৈত তাঁকে জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তির উপদেশ দিয়েছিলেন, তখনও অদ্বৈত আচার্য্য শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নি অর্থাৎ দামাল নিমাইয়ের তখনও শ্রীচৈতন্যে আবির্ভাব ঘটে নি। নরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে যে শংকরের কথা রয়েছে তিনি এই শংকরদেব হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গে শংকরদেবের সম্পর্কের কথা রয়েছে।

শংকরদেবের প্রধান দুই শিষ্য মাধব ও দামোদর। এই দুই শিষ্যকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে মহাপুরুষীয়া ও দামোদরীয়া সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে।

মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের অনুগত লেখকদের নাম- রামচরণ, দৈত্যারি ঠাকুর ও ভূষণ দ্বিজ কবি। এঁদের রচিত তিনখানি গ্রন্থেই রয়েছে যে, শংকরদেব যখন দ্বিতীয়বার তীর্থ ভ্রমণে যান তখন পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়।

দামোদরের শিষ্য রাম রায় বা রামকান্ত দ্বিজ 'গুরু লীলা' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও শংকরের মিলনের কথা লিখেছেন। 'গুরুলীলা' তে হয়েছে- "কন্ঠ ভূষণের মুখে শুনিছে শঙ্কর। কৃষ্ণ চৈতন্য হয়া হৈছে অবতার।। ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যেও কহিছে পূর্বত। ব্রহ্ম হরিদাসে পাশে কৈলা শঙ্করত।। সেই কথা সুমরি শঙ্কর মৌন ভৈলা। রাম নাম গুরু নামে উচর চাপিলা। অবনত হয়া দুই নামিলা সাক্ষাৎ। পূর্বাপর পুছিলন্ত কথা যত যত।। শঙ্কর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী। কমণ্ডুলু জল ঢালি বুঝাইয়া আপনি। শঙ্করেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে। এক যে শরণ ধর্ম

চৈতন্যর স্থানে।। ‘গুরুলীলা’-য় শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর, দামোদর, মাধব, গোপাল, বলদেব, পরমানন্দ, বনমালী, এবং মিশ্রের ছবি লিখিতানুক্রমে রয়েছে। চৈতন্যদেব বামদিকে মুখ করে বসে আছেন, শঙ্কর ও অন্যান্য সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ শ্রীচৈতন্যের দিকে।

দামোদরের অপর শিষ্য কৃষ্ণ ভারতীর রচিত ‘সন্ত নির্ণয়’ গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক কথা রয়েছে। সেখানেও শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যের মিলনের কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রমাণ করা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান। ‘নৃসিংহকৃত্য’ নামক একখানি গ্রন্থ থেকে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কিছু কথা উদ্ধৃত হয়েছে কৃষ্ণ আচার্য্য রচিত ‘সন্ত বংশাবলী’ গ্রন্থে।

‘দীপিকা চান্দ’ নামক গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যের কথা রয়েছে। বরদোবার ‘গুরু চরিত্র’ পুঁথিতে শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যের মিলনের কথা আছে।

অদ্বৈত আচার্য্যের এক পুত্র আসামে যেয়ে শ্রীচৈতন্য ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন বলে প্রবাদ রয়েছে। আসামে এও প্রবাদ আছে যে, শঙ্করদেব যখন দ্বিতীয়বার তীর্থ ভ্রমণে পুরীতে ছিলেন তখন শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ১৪৮৬ সালে, তিরোভাব ১৫৩৩ সালে। গুরু নানকের জীবনকাল ১৪৬৯ সাল থেকে ১৫৩৮ সাল। অতএব, উভয়েই সমসাময়িক। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে গুরুনানকের সাক্ষাৎকার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। গুরুনানকের শিষ্যগণও তাই মনে করেন। কারও কারও মতে গুরুনানক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গুরু করেছিলেন। উড়িয়া ভাষায় ‘চৈতন্য ভাগবতে’র লেখক এবং শ্রীচৈতন্যকে বুদ্ধের অবতার রূপে পূজক ঈশ্বর দাসের মতে গুরুনানক শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করেছিলেন।

শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবের অনুগত মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায় ভুক্ত অসমীয়া লেখক রামচরণ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ও কবির সম্পর্কে কিছু কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, কবিরের মৃতদেহ নিয়ে তাঁর হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হলে শ্রীচৈতন্য এসে ঐ শবদেহ নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং

নিজের হাতেই তা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলেন– 'চৈতন্য গোঁসাই হেন কথা শুনিলন্ত। শীঘ্র বেগ করি তেঁহো খেদি আসিলন্ত। কবিবর শব তুলি কান্ধত লইলন্ত। চৈতন্য গোসাই তাঙ্ক ভাসাল গঙ্গাত।' কবির ১৫১৮ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে কাশীতে পরলোক গমন করেন। শ্রীচৈতন্যও সেই সময় কাশী ভ্রমণ করছিলেন। সেই কারণে এই ঘটনা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। অমিত শক্তিধর শ্রীচৈতন্যের পক্ষে কবিরের মৃতদেহ বহন করা অসম্ভব নয়। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যে উক্তি তুলে ধরা হয়েছে রামচরণ ঠাকুরের লেখনীতে তা শ্রীচৈতন্যের রচিত 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্ণাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো, নো বা বর্ণী ন চ গৃহ পতির্ণো বনস্থো যতিবা,'–এই শ্লোকটির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। শ্রীচৈতন্য কর্তৃক কবিরের মৃতদেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবার ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে রামচরণ ঠাকুর লিখেছেন– "মাধব দেবের মুখে যিমত শুনিলোঁ। তান বাক্য পালি মই তেহ্ন লিখিলোঁ।" অর্থাৎ শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেবের কাছে তিনি যেমন শুনেছেন তেমনই তিনি লিখেছেন। কবিরের মৃতদেহ নিয়ে তাঁর হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে যে বিবাদ হয়েছিল সে তো ঐতিহাসিক সত্য। হিন্দুশিষ্যগণ চেয়েছিল তাঁর মৃতদেহ দাহ করতে, আর মুসলমান শিষ্যগণ চেয়েছিল মৃতদেহ কবর দিতে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের এই ঐতিহাসিক সত্যতার পাশাপাশি এও সত্য, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কবিরের এমন সুসম্পর্ক ছিল যে তার ফলেই শ্রীচৈতন্যের পক্ষে কবিরের মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, একজন অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ নিয়ে হঠাৎ এমন ঘটনা সম্ভব হতে পারে না। শ্রচৈতন্যের সঙ্গে কবিরের পরিচিতি অবশ্যই ছিল, সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যকে তিনি শ্রদ্ধাও করতেন। সে কারণেই কবিরের মৃতদেহের উপর শ্রীচৈতন্যের অধিকার ছিল, আর কবিরের হিন্দু মুসলমান শিষ্যগণও তা মেনে নিয়েছিল।

জয়ধর্মের শিষ্য বিষ্ণুপুরী মাধবেন্দ্র পুরীরও শিষ্য। তিনি ভক্তি রত্নাবলীর লেখক। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন এবং শেষ বয়সে শ্রীচৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে এসে বিষ্ণুপুরী তাঁর ভক্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপাও লাভ করেছিলেন তিনি। হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থের টীকাকার প্রিয়দাসজীর মতে মহাপ্রভুর পত্র পেয়ে বিষ্ণুপুরী ভক্তিরত্নাবলী সংকলন করে পাঠিয়েছিলেন।

বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য বল্লভাচার্য্যের জীবনকাল ১৪৭৯ সাল থেকে ১৫৩১ সাল। ইনি বল্লভচারী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। দক্ষিণ ভারতে এই ধর্মমত বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। বল্লভাচার্য্য বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বয়সে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা সাত বছরের বড় ও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বল্লভাচার্য্যের মিলনের পরে বল্লভাচার্য্যের মতবাদের পরিবর্তন হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের ভাগবতী মহিমা বল্লভাচার্য্যকে আত্মস্যাৎ করে নিয়েছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁকে কৃপা করেছিলেন। এই কৃপা প্রাপ্তির পরেই বল্লভাচার্য্য রচনা করেছিলেন 'কৃষ্ণ প্রেমামৃত' ও 'কৃষ্ণস্তব'। বল্লভাচার্য্য পরলোক গমনের পূর্বে তাঁর এই পরিবর্তিত মতবাদের ভিত্তিতে রচিত শিক্ষা শ্লোকে পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। ১৫৭৬ সালে কবি কর্ণপূর কর্ত্তৃক রচিত "গৌর গণোদ্দেশদীপিকা"-য় বল্লভাচার্য্যকে শ্রীচৈতন্যের গণ বলা হয়েছে সে কারণেই এবং সঙ্গতভাবেই। প্রকৃতপক্ষে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের আলাদা অস্তিত্ব নেই, ঐ সম্প্রদায় চৈতন্যধর্মে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

বিখ্যাত মারাঠা সাধু তুকারামের জন্ম পুনার নিকটবর্তী দেহুক নামক স্থানে। তিনি ছিলেন সাতারা ও পুনার কাছে ভীমা নদীর তীরস্থ পাণ্ডুপুরবাসী। সেখানে তিনি শ্রী কৃষ্ণকে বিঠলদেব নামে পূজা করতেন। তিনি বিঠলদেবের সম্মুখে গান গাইতেন, তাঁর ভক্তগণ তা লিখে রাখতেন। সেই গানগুলির নামই তুকারামের আভঙ্গ। তুকারামের আচরিত ধর্মের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্মের বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্য অনেক বেশি। তুকারামের গুরু কে, গুরুর কাছ থেকে কি মন্ত্রই বা তিনি পেয়েছিলেন, তার এক সুন্দর চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তাঁর আভঙ্গে। সেখানে তিনি বলেছেন, "মাঘ মাসে এক বৃহস্পতিবারে শুক্লা দশমী তিথিতে গঙ্গা (ভীমা) স্নানে যাচ্ছিলাম। সেই সময় প্রভু আমাকে দর্শন দিলেন। আমাকে রাম, কৃষ্ণ, হরি এই তিনটি নাম দিলেন ও রাঘব-চৈতন্য কেশব-চৈতন্য বললেন। সেই প্রভু নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি 'বাবাজী'। তারপর আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি অচৈতন্য হয়ে গেলাম। চেতনা পেয়ে দেখি প্রভু নিজের কাজে চলে গিয়েছেন। ফলে প্রভুর সেবা করা আমার ভাগ্যে হল না।"

জ্ঞানেশ্বরী **শ্রী সুকৃতি রায়চৌধুরী**

(১)

মারাঠি সাহিত্যে 'জ্ঞানেশ্বরী' একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। এর রচয়িতা সন্ত জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদেব।

জ্ঞানেশ্বরের জন্মতারিখ হিসেবে নানা মত প্রচলিত আছে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় ১২৭১ সালেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলে স্থির হয়েছে। জন্মস্থান হিসেবে কেউ বলেন আলানভি গ্রামে এঁর জন্ম; ভিন্ন অভিমত হল গোদাবরী উপত্যকায় আপেগাঁও গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের পরিবার ছিলেন নাথপন্থী। জ্ঞানেশ্বরের পিতা বিঠলপন্থ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি। এঁর মাতার নাম রুক্মাবাই। দীর্ঘদিন কোন সন্তানাদি না হওয়ায় বিঠলপন্থ গৃহত্যাগ করে বারাণসীতে চলে যান। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্যক্তি হয়ে তিনি গার্হস্থ্যধর্ম পালন করেন নি এবং স্ত্রীর ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা না করেই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। পরে গুরুর নির্দেশে তিনি গৃহে ফিরে আসেন ও সংসার ধর্ম পালন করেন। এদিকে সন্ন্যাসী থেকে গৃহী হওয়ার অপরাধে তিনি সমাজচ্যুত হন। যথাসময়ে তিনি চারিটি সন্তানের জনক হলেন। প্রথম পুত্র নিবৃত্তিনাথ, দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেশ্বর, তৃতীয় পুত্র সোপানদেব ও সর্বকনিষ্ঠ সন্তান কন্যা মুক্তাবাই। সমাজচ্যুত হয়ে বিঠলপন্থ গ্রামের বহির্সীমায় বসবাস করতে লাগলেন। উপনয়নের সময় কোন ব্রাহ্মণই তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন না। তখনকার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের নির্মম ঔদাসীন্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিঠলপন্থ ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাসিকে চলে আসেন এবং নিজেদের শুদ্ধি করার মানসে ত্র্যম্বকেশ্বরের নিকটবর্তী ব্রহ্মগিরি পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেন। কথিত আছে একদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাদের সামনে একটি বাঘ এসে উপস্থিত হয়। প্রাণভয়ে সকলে পালায়, কিন্তু নিবৃত্তিনাথ রয়ে যান। গহন বনে এক গুহায় তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন এবং সেখানে গৈনীনাথ নামে এক সাধুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানেশ্বরকে 'নাথ' পন্থে দীক্ষা দেন। সোপানদেবও একই পন্থা অনুসরণ করেন। মুক্তাবাই ভক্তিতন্ত্রের এক উল্লেখযোগ্য কবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

DO NOT COPY

সমাজে একঘরে হয়ে থাকতে কার আর ভালো লাগে? তাই বিঠল পন্থের মৃত্যুর পর তাঁরা সকলে চলে আসেন পাইথানা নামে গ্রামে। সেখানকার ব্রাহ্মণদের নিকট থেকে শুদ্ধি লাভ করার মানসে তাঁদের এই যাত্রা। পুনরায় তাঁরা সমাজে ব্রাহ্মণ হিসেবে ঠাঁই পেলেন ১২৮৭ খৃঃ। সেখান থেকে তাঁরা চলে আসেন নেভাসা নামক স্থানে। সেখানে জ্ঞানেশ্বর দৈব শক্তির বলে সচ্চিদানন্দ বাবা নামে এক সাধুর রোগ নিরাময় করে দিয়ে খ্যাতিলাভ করেন। এতে প্রীত হয়ে সচ্চিদানন্দ জ্ঞানেশ্বরের হয়ে তাঁর রচিত বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ জ্ঞানেশ্বরী লিখতে রাজী হন। 'জ্ঞানেশ্বরী' ও আরেকটি ধর্মগ্রন্থ 'অমৃতানুভব' লেখবার পর তিনি আলানভীতে ফিরে আসেন এবং সমাধিলাভ করেন।

(২)

'জ্ঞানেশ্বরী'র অনেকগুলি ভিন্ন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। কোনটি যে মূল গ্রন্থ এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ১৯০৭ সালে আর ভি মাভগাঁওকার, ১৯০৯ সালে ভি কে রাজওয়াড়ে এবং ১৯১৩ সালে এ এস কুন্তে কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞানেশ্বরীর মধ্যে কোনটি নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি তা নিয়ে গবেষণা চলে বম্বে ষ্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে। রাজওয়াড়ে কৃত গ্রন্থটিকেই তাঁরা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত করেছেন। নানা পণ্ডিত এর ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে বিঠল গণেশ প্রধান প্রকাশিত গ্রন্থটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মূল জ্ঞানেশ্বরী ১২৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত।

জ্ঞানেশ্বরীর মূল বক্তব্য হল জ্ঞানেশ্বর কৃত ভগবদ্‌গীতার স্বচ্ছন্দ ব্যাখ্যা। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে যে পর্বে অর্জুনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে তার নতুন ব্যাখ্যা করেছেন জ্ঞানেশ্বর ভগবদ্‌গীতার আলোকে। জ্ঞানেশ্বরীর আর এক নাম ভাবার্থদীপিকা। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সংলাপের মধ্য দিয়ে হিন্দুদর্শনের যে প্রকাশ, তারই মাঝে মাঝে জ্ঞানেশ্বর আপন বক্তব্য পেশ করেছেন – পড়তে পড়তে মনে হবে যে তিনি শিষ্যদের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন। জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত এই বচনসুধাই জ্ঞানেশ্বরীকে শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ করে তুলেছে। এ যেন কীর্তনের পদ, সুরে ও ছন্দোবদ্ধতায় অনুপম

DO NOT COPY

এই পংক্তিগুলি মানব জীবনে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির উপকারিতার কথা বলেছে। মানবাত্মার মুক্তির কথা বলেছে।

জ্ঞানেশ্বরী যে সময় রচিত হয় (১২৯০ খৃঃ) তখনকার সময় মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অবস্থা কি ছিল সেটি পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। তাহলে জ্ঞানেশ্বরীর অবদান সম্পর্কে সম্যক স্বরূপটি জানা যাবে।

সে সময়কে মারাঠি সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা যেতে পারে। একদিকে গোদাবরী উপত্যকা, সহ্যাদ্রি পর্বতমালা, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর উপকূলের সমতল ভূমি – বিরাট এই ভূখণ্ডের রাজধানী ছিল দেবগিরি। মুঘল আমলে এই অংশের নাম হয় দৌলতাবাদ। যাদব বংশের নৃপতিরা তখন রাজ্য শাসন করতেন। জ্ঞানেশ্বরের সমসাময়িক যে নৃপতি, তিনি হলেন রামদেব রায়, যিনি ১২৭১ থেকে ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জ্ঞানেশ্বরীতে এঁর নামের উল্লেখ আছে। মহারাষ্ট্রগগনে এটি স্বর্ণযুগ – প্রজারা ছিল সুখে সমৃদ্ধিতে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে। পরে মুঘলেরা এটি অধিকার করেন ১৩১৮ খৃঃ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই মহারাষ্ট্রে এক ধর্মবিপ্লব শুরু হয়। শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, উত্তর ভারতে ও বঙ্গদেশেও এর ঢেউ এসে লাগে। ধর্ম সম্বন্ধে নতুন চেতনাবোধ জাগে দেশবাসীর মনে। দক্ষিণ ভারতেও অনুরূপ ধর্মান্দোলন শুরু হয়। পুরোনো দিনের আন্দোলনে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পেত দার্শনিক তত্ত্বে, যার সঙ্গে মাটির মানুষের যোগ ছিল সামান্য। বর্তমানে যে ঢেউ এল, তা এল মাটির মানুষকে ঘিরে তার কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে তার ভক্তিরসে প্রাণশক্তি সঞ্চার করে। তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে ধর্ম একাত্ম হয়ে প্রকাশ পেল। বিষ্ণুর অবতার হলেন কৃষ্ণ – তাঁর নামগানে মেতে উঠলেন তাঁরা, দর্শনের কচকচানি বা রক্ষণশীলদের আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা নিয়মকানুনের গণ্ডী যাঁদের সয় না। যোগাভ্যাস রইল ব্রাহ্মণদের জন্য, সাধারণ মানুষেরা ভগবানের সান্নিধ্য পেতে বেছে নিলেন সহজ সাধারণ পথ নামগান। ভক্তিই হল মুক্তির পথ। ভক্তি ত সহজে আসে না – তার জন্য চাই পুজো, আরাধনা, চাই বিশ্বাস, চাই একাগ্রতা – তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব। তাই ভগবৎপ্রেমে বিশ্বাসী ভক্তগণ একাগ্রচিত্তে নামগান শুরু করলেন,

শুরু করলেন কীর্তন, ভজন, শুরু করলেন তীর্থ পরিক্রমা। মহারাষ্ট্রে পাণ্ডারপুরে রয়েছেন ভগবান বিঠল – আজও সেখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমবেত হন।

এই ধর্মান্দোলনের ফল হল দ্বিবিধ। শাসকদের আঘাতে মুষড়ে পড়া মারাঠি জাতির মনে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে এলেন যুগপুরুষেরা। তাঁদের সাহিত্যিক অবদানে এল নবযুগ। দ্বিতীয়তঃ মানুষের মনের ধর্মবিশ্বাসকে সহজ সরলভাবে প্রকাশের জন্য এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হল। মারাঠি ভাষা হল সমৃদ্ধ। এতদিন সংস্কৃত ছিল পণ্ডিতদের ভাষা – এখন তা সরলীকৃত হয়ে সাধারণের মধ্যে অশেষ প্রভাব বিস্তার করল।

জ্ঞানেশ্বরী রচিত হবার পূর্বে মুকুন্দরাজের আধ্যাত্মিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি ছিল সাহিত্যের ধ্বজাবাহী। ইনি ছিলেন যাদব নৃপতিদের একজনের ধর্মগুরু ও কাব্যে রচিত হয়েছিল তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ। দুরূহ সংস্কৃতই ছিল ভাষা প্রকাশের মাধ্যম। একথা অনস্বীকার্য যে ইতিমধ্যে সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতেও ভাষাকে উন্নত করবার চেষ্টা চলেছে অব্যাহত।

প্রধানতঃ দুটি সম্প্রদায় এযুগে ধার্মিক চেতনাকে জিইয়ে রেখেছিলেন। প্রথম হলেন মহানুভব সম্প্রদায়, দ্বিতীয় নাথপন্থী। ভক্তিবাদকে প্রধানতঃ এঁরাই জনপ্রিয় করেছেন।

মোটামুটি এই হল রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় পটভূমিকা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে এলেন জ্ঞানেশ্বর। মানুষের মনে নব চিন্তাধারা সঞ্চারিত করলেন তিনি। অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় রচনা করলেন যে মহাকাব্য, তার বিশালতা উৎকর্ষতা আজও কোন গ্রন্থ অতিক্রম করতে পারেনি। ভাবপ্রকাশের অপূর্ব ব্যঞ্জনা, সহজবোধ্যতা মানুষের মনে ধর্মভাবের প্লাবন এনে দিল। ভগবদ্ গীতার ব্যাখ্যায় সমুজ্বল হল ভাবার্থদীপিকা। সর্বজাতির সর্বশ্রেণীর মানুষকে ভাগবতী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে যে মহৎ রচনা , তাই হল জ্ঞানেশ্বরী। শুধু তাই নয় – জ্ঞানেশ্বরী পাঠে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মীয় নেতারা লিখলেন 'অভঙ্গ' – যার মিষ্ট মধুর গীত সুধা আপনার মনকে মাতিয়ে তুলবে। এলেন উত্তরসূরী হিসাবে আরো কত মহাপুরুষ। এলেন তুকারাম প্রমুখ কত সন্ত সাধু। জ্ঞানেশ্বরীর প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী ভাবলে অবাক হতে হয়।

সমর্পণ - Surrender

শ্রীঅরবিন্দ

১

ওগো তুমি যন্ত্র আমি যার
দেহাধারে আবাসিত হে গোপন আত্মা ও প্রকৃতি,
তোল এবে গড়ি সবটুকু এই মর সত্তারে আমার,
নিস্তব্ধ গৌরব মাঝে তব ভগবতী ।।

২

দিয়েছি আমার মন ভাঙিয়া গড়িতে এক মালা তব মানসের
সঁপেছি ইচ্ছারে মোর তব ইচ্ছায় প্রকাশিত হতে
কোন কিছু যেন পড়ে নাহি থাকে মম সত্তার
অনির্বচনীয়, নিগূঢ় মিলনে তব সাথে ।।

৩

হিয়া সাথে ধরণীর কাঁপিবে মম হিয়া আবেশেতে তব প্রেম-পরশের
দেহ মোর হবে পরিণত যন্ত্রে এক তব পার্থিব ব্যবহারে
স্নায়ুতন্ত্রে মোর আর শিরাগুলি মাঝে বহিবে স্রোতের ধারা তব রভসের
চিন্তাগুলি মম হবে শিকারী-কুকুর আলোকের
ছেড়ে দিতে তব শক্তি তরে।

৪

আরাধনা করিতে তোমায় চিরকাল রাখ ছেড়ে
শুধু আত্মারে আমার
লভিতে মিলন তব সাথে ভিন্ন ভিন্ন আকারেতে তব,
আর সাথে তব-আত্মার ।।

অনুবাদঃ উমাপদ

DO NOT COPY

শূন্য বলে কিছু নেই

সুনন্দন ঘোষ

ছোটবেলায় শখ ছিল বাবার গেঞ্জী জুতো পরার,
সবগুলোই কত্তো বড়, তবু কি ভালোই লাগতো!
বাবা হলাম,
দেখলাম মেয়েও ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার জামা জুতো পরে।

ছোটবেলায় বড় হতে চাই সবাই,
তারুণ্য যৌবনের তৃষ্ণা শেষ হলে
বার্দ্ধক্যে ফিরে যেতে চাই নিরুদ্বিগ্ন শৈশবে।

যেতে চাই,
যেতে হবে প্রকৃতির চিরন্তন পথ ধরে।
সর্বাঙ্গে বাজছে বিটিং রিট্রিট –
অনেক যুদ্ধ হলো।
ছাড়তে হবে এই রণভূমি –
আবার নতুন সংগ্রাম –
শরীর থেকে শরীরে চেতনার সংক্রমণ।

শূন্য মনে হয় যে জগত – দৃষ্টির সমক্ষে থেকেও অদৃশ্য,
সেখানে অপেক্ষা করছেন ছোটবেলার মাস্টারমশাই,
হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর দল, স্নেহার্দ্র আত্মজন।
আর সবার আগে দুহাত বাড়িয়ে সেই মানুষ
যাঁর জন্য বারবার বলতে হয় –
“পিতা নোঽসি” ---

শূন্য বলে কিছু নেই –
জন্ম থেকে জন্মান্তর –
সব শূন্য পূর্ণ হয়ে আছে
অলৌকিক প্রেমে।

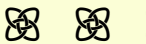

DO NOT COPY